দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

JAN 15 2002

সাক্ষরতা পরিসংখ্যান ও বাস্তবতা

পাঠকের প্রতিক্রিয়া

'সংবাদ'-এর গত ১৮ই সেপ্টেম্বর ২০০১ সংখ্যার ক্যাম্পাস পাতায় প্রকাশিত আ. ন. স হাবিবুর রহমান লিখিত 'সাক্ষরতা পরিসংখ্যান ও বাস্তবতা' শিরোনামে লেখাটি আমার পড়ার সুযোগ হয়েছে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, সাক্ষরতা- এসব পরিসরে কাজ করছি বলে এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার ইচ্ছা পোষণ করছি।

এখন থেকে প্রায় ২৪ বছর আগে বৃহত্তর নোয়াখালীতে এনআরডিপি প্রকল্পের আওতায় ডানিডার আর্থিক সহায়তাপুষ্ট একটি বৃহৎ গণশিক্ষা কর্মসূচি চালু হয়, যা ১৯৯২ সালে এসে শেষ হয়ে যায়। ওই প্রকল্পের একজন কর্মী হিসেবে প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থান করে নোয়াখালীর ১৫টি থানায় প্রায় ২৫ হাজার শিক্ষাকেন্দ্র প্রত্যক্ষণের সুযোগ হয় আমার। ঐ প্রকল্পে কাজ করতে গিয়ে ১৯৮৫ সালের দিকে আমরা বিচ্ছিন্ন এলাকায় কাজ না করে একটি নির্দিষ্ট এলাকায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সকল মানুষকে সাক্ষর করার প্রস্তাব উত্থাপন করি; কিন্তু কর্তৃপক্ষ এ প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। আমরাও এক সময় বুঝতে সক্ষম হই যে, যদি সাক্ষরদেরকে সাক্ষরতার পাশাপাশি অপরাপর উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করা না যায় তাহলে সার্বিক সাক্ষরতা অর্থহীন হয়ে পড়ে। বলাবাহুল্য এনআরডিপি প্রকল্পটি একটি সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্প হলেও সকল মানুষের কাছে উন্নয়ন সহায়তা পৌঁছানোর মতো ক্ষমতা ওই প্রকল্পের ছিল না। ফলে এলাকাভিত্তিক সার্বিক সাক্ষরতা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

সে যাই হোক, ১৯৭৯-৯২ সময়কালে নোয়াখালী জেলায় সংগঠিত গণশিক্ষা কর্মসূচির আওতায় লাখ লাখ মানুষকে সাক্ষরতা প্রদান করা হয়েছে; কিন্তু দুর্ভাগ্য ১৯৯৫-৯৭ সালের দিকে একই এলাকায় অন্য এনজিওদের দ্বারা পরিচালিত শিক্ষাকেন্দ্রে আমরা একই শিক্ষার্থীদের অনেককেই পুনরায় বয়স্ক শিক্ষার পাঠ নিতে দেখেছি। বলাবাহুল্য পূর্বেকার সাক্ষরতা দক্ষতা হারিয়ে তারা নিরক্ষরে পর্যবসিত হয়েছিল এবং স্বভাবগত কারণেই তারা পুনরায় শিক্ষাকেন্দ্রে ভর্তি হয়েছিল। পরবর্তীকালে সে একই এলাকায় সরকারিভাবে পরিচালিত টিএলএম কর্মকাণ্ডে নিরক্ষর কিংবা সাক্ষরতাপ্রাপ্তদের পরিসংখ্যান আমাদের বিস্মিত করেছে।

সাক্ষরতা কুশলী এবং শিক্ষাবিদ মাত্রই অবগত আছেন যে, সাক্ষরতা শিক্ষার মতো একটি বহুমাত্রিক বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডে প্রশিক্ষিত কুশলীর অংশগ্রহণ প্রয়োজন এবং আমরা এ কৌশল অর্জন করার জন্য যৌবনের সবচেয়ে সুন্দর দিনগুলো প্রত্যন্ত অঞ্চলে কাটিয়েছি এবং গণমানুষের সাথে অবস্থান করে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে কাজ করেছি। সাক্ষরতা উপকরণ উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ কোর্স প্রণয়নসহ নানাবিধ কাজে যুগপৎভাবে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে আমাদেরকে দেশী-বিদেশী নানা বিশেষজ্ঞের সংস্পর্শে আসতে হয়েছে এবং দেশে-বিদেশে অনেক প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করারও আমাদের সুযোগ হয়েছে। তথাপি বর্তমানে আমাদের মনে হয় অদ্যাবধি সাক্ষরতা কার্যক্রম পরিকল্পনায় আমরা যথাযথ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ ঘটাতে পারছি না এবং এসব বিষয়ে আমাদের আরো পর্যাপ্ত গবেষণা কর্মে এগিয়ে আসা উচিত। না হলে সাক্ষরতা ক্ষেত্রে গৃহীত যাবতীয় কর্মকাণ্ড অসার বলে প্রতীয়মান হবে এবং জাতীয় অর্থের অপচয়সহ সময়ের অপচয় হবে মারাত্মকভাবে।

শুধুমাত্র টিএলএম কেন বাংলাদেশে বিদ্যমান অনেক উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমকেই মানসম্মত বলা যাবে না। এমনকি বয়স্ক শিক্ষা, সাক্ষরতা কিংবা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মূল দর্শন বা বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি না করেই বর্তমানে অনেক সংস্থা এসব কর্মকাণ্ডের বাস্তবায়ন করেছে এবং তারা দাতাগোষ্ঠীর সহায়তাও পাচ্ছে। সামাজিক ও জাতীয় পর্যায়ে বিদ্যমান অন্যান্য অনেক গাফিলতি ও মানহীন কর্মকাণ্ডের মতো সাক্ষরতা ক্ষেত্রটিও আজ মান হারাতে বসেছে। অনেক সংস্থাতেই সাক্ষরতা বিষয়ক কর্মকাণ্ডে এমন অনেক বিশেষজ্ঞ নিয়োজিত রয়েছেন যাদের সাক্ষরতা কর্মকাণ্ডের তেমন কোন প্রশিক্ষণ কিংবা অভিজ্ঞতা নেই। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সাথে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাকে এক করে ফেলে তারা এমন সব ব্যবস্থাপত্র তৈরি করছেন যা সাক্ষরতা পর্যায়ে কোন কল্যাণকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে না, বরং মানসম্মত শিক্ষা বিস্তারে উপানুষ্ঠানিক ধারাটিকে দুর্বোধ্য করে তুলছে প্রতিনিয়ত।

উন্নয়নকাজে অংশগ্রহণ ও অংশীদারিত্বের কোন বিকল্প নেই। সাক্ষরতা কাজেও ব্যাপক নাগরিক সমাজের অংশগ্রহণ বাঞ্ছনীয়। তবে তার অর্থ এই নয় যে, প্রশাসনিক সার্ভিস থেকে অবসর নেয়ার পর কোন কর্মকর্তা সাক্ষরতা কার্যক্রমে প্রশিক্ষণ-বিশেষজ্ঞ কিংবা গবেষণা-বিশেষজ্ঞ হিসেবে যোগদান করবেন এবং ওইসব ক্ষেত্রে প্রশিক্ষিত কর্মীদের মানহীন দিকনির্দেশনা প্রদান করবেন। শিক্ষা উপকরণ প্রণয়নে কিংবা অন্য কোন পদ্ধতিগত কার্যক্রম বাস্তবায়নে অনেক প্রথিতযশা এনজিও আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ক্ষেত্রে কর্মরত কনসালট্যান্টদের নিয়োজিত করেছে এবং তাদের পরামর্শক্রমে উন্নীত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা উপকরণ কিংবা আনুষ্ঠানিক পদ্ধতির চেয়েও কঠিনতর রূপ ধারণ করেছে।

পেশাজীবী কর্মীবাহিনীর উন্নয়ন কোন সহজ কাজ নয়, এজন্য সুচিন্তিত ও দক্ষতাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করা দরকার। এদেশে অন্য অনেক ক্ষেত্রের মতো সাক্ষরতা ক্ষেত্রেও পেশাজীবী কর্মী উন্নয়নে কোনো কার্যকর কর্মকৌশল প্রণীত হয়নি এবং অনেক ক্ষেত্রেই পেশাজীবীদের পৃষ্ঠপোষকতা করা হয়নি। ফলে পেশাজীবীরা এদেশে পেছনে পড়ে রয়েছে যার সুযোগে অনেক ক্ষেত্রে সামনের কাতারে চলে এসেছে সাক্ষরতা ক্ষেত্রে পেশাজীবী নন এমন ব্যক্তিরা।

সাক্ষরতা ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী কর্মকাণ্ডের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, তবে তা করতে গিয়ে এদেশে যথেষ্ট পরিমাণে পুনরাবৃত্তি করা হয় এবং এমনসব ক্রিয়াকলাপের এক্সপেরিমেন্ট করা হয় যা সাক্ষরতা কার্যক্রমকে বেগবান তো করেই না বরং তা থিতিয়ে দেয়। এসব ক্ষেত্রে কোনো কার্যকর নিয়ন্ত্রণ এদেশে এখন পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত করা যায়নি। ব্রাজিলিয়ান শিক্ষাবিদ ফাওলো ফ্রেরির মতাদর্শ অনুসৃত হচ্ছে দাবি করা হলেও অনেক সংস্থার সাক্ষরতা কার্যক্রম পরিকল্পনায়ই জনগণকে মানব সম্পদে পরিণত করে তাদের ক্ষমতায়ন ঘটানোর কোন সুস্পষ্ট নির্দেশনা নেই। গ্রুপ-এপ্রোচ, কমিউনিটি-এপ্রোচ ইত্যাদি অভিধার আড়ালে তলিয়ে যেতে বসেছে মানবমুক্তির দিশারী উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য।

বস্তুত আমাদের রয়েছে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সুবিশাল ঐতিহ্য। প্রাচীন ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে এ অঞ্চলে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমেই ব্যাপক জনগোষ্ঠী জীবনধারণের প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করত। রাষ্ট্রীয় কাঠামো প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রবর্তন ঘটে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে দুটি ধারা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। বৈদিক যুগ, মধ্যযুগ এমনকি মুসলিম আমলেও শিক্ষার উপানুষ্ঠানিক ধারাটি অত্যন্ত বেগবান ছিল; কিন্তু বৃটিশ রাজত্বের সময়ে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাধারাটি নিভু নিভু হয়ে পড়ে। বৃটিশরা এ অঞ্চলে বিদ্যমান লাখ লাখ বুনিয়াদি শিক্ষাকেন্দ্রের কোনোরূপ পরিচর্যা না করেই তারা তাদের মতো করে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়। পাকিস্তান আমলেও সে ধারাটি অব্যাহত থাকে আর বাংলাদেশ আমলে ১৯৭৩ সালে প্রায় ৩৪ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের ফলে মৌলিক শিক্ষাক্ষেত্রে জনগণের অংশগ্রহণের প্রক্রিয়াটি কার্যত ধ্বংস হয়ে যায়।

বর্তমানে ভাবতে অবাক লাগে যে, জাতীয়করণকৃত সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ই জনগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও লালিত ছিল। যখনই সরকার এসব প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব নিল তখনই জনগণ দায়িত্ব পালন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। যার ফলে আপামর জনসাধারণ তথা দরিদ্র জনগোষ্ঠী কাঠামোধীন আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রক্রিয়া থেকে দূরে সরে পড়ল এবং শামিল হলো নিরক্ষরতার কাতারে। এমতাবস্থায় পুনরায় বেগবান হলো উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাধারা। মরহুম আ. কুদ্দুস, ফেরদৌস খান, জেমস জেনিংস প্রমুখের পৃষ্ঠপোষকতায় এ ধারণাটি পুনরায় জনপ্রিয় হলো এবং ধীরে ধীরে তৈরি হলো একদল উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা-কুশলী। চাকরি করা নয় বরং ব্যবহারিক শিক্ষা ও উন্নয়নকর্মী হিসেবে তারা মানবতার মুক্তির লক্ষ্যে কাজে শুরু করলেন। ১৯৭৫-৮০ সময়ে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা তথা বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম চালাতে গিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছেন এদের মধ্যে অনেক উন্নয়নকর্মী। তবু তারা দমে যাননি। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের উন্নয়নের লক্ষ্যে তারা উদ্ভাবন করেছেন নতুন নতুন উন্নয়ন উপকরণ।

১৯৮০ সালে সরকার বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করলেও মূলত ১৯৯০ সালের দিকে সরকারিভাবে কাঠামোধীন প্রক্রিয়ায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য উদ্যোগ গৃহীত হয়। এ সময়ে সরকারিভাবে বয়স্ক শিক্ষার শিক্ষাক্রম এবং পরবর্তীকালে উপকরণ উন্নয়নের উদ্যোগও নেয়া হয়। আ. ন. স হাবিবুর রহমানসহ বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত বিশেষজ্ঞরা এ সকল উপকরণ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত থাকলেও বিদ্যমান বয়স্ক শিক্ষা উপকরণসমূহের কোনোরূপ পরিচর্যা না করেই সেই সময়ে সরকারিভাবে বয়স্ক শিক্ষার আলাদা পদ্ধতি কিংবা উপকরণ তৈরি করার প্রয়োজনীয়তা ছিল কি না এটাও বিরাট প্রশ্নের উদ্রেক ঘটায়।

মূলত এভাবেই এক পর্যায়ে সরকারি উদ্যোগে অত্যন্ত কাঠামোধীনভাবে শিশু-কিশোর এবং বয়স্কদের জন্য সাক্ষরতা কর্মসূচি চালু হয়। এসকল কর্মসূচি চালাতে গিয়ে তারা অনেক দেশী-বিদেশী বিশেষজ্ঞের সহায়তা গ্রহণ করে। বলাবাহুল্য এসকল বিশেষজ্ঞের সাক্ষরতা অভিজ্ঞতা নিয়ে বিভিন্ন মহলে সংশয় থাকলেও তাদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিচালিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম একটি বিশেষ রূপ ধারণ করে। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অনেক বেসরকারি সংস্থাই তখন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাক্ষেত্রে নিজেদের উদ্ভাবিত কর্মকাণ্ড থেকে সরে এসে অথবা বিদ্যমান কর্মকান্ডের পাশাপাশি সরকারিভাবে পরিকল্পিত পদ্ধতি বাস্তবায়নে ব্রতী হয়। জাতীয় পর্যায়ে কর্মরত অনেক প্রতিষ্ঠিত সংগঠনেও নিজেদের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচির পাশাপাশি সরকারিভাবে পরিকল্পিত কর্মসূচি বাস্তবায়িত হতে থাকে।

এতে হয়ত ক্ষতি তেমন নেই; কিন্তু কথা হচ্ছে একই সংগঠনের আওতাভুক্ত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাক্ষেত্রে দু'ধরনের পদ্ধতির আবশ্যকতা কোথায়? শুধুমাত্র পাইলটিংয়ের ক্ষেত্রেই এ অবস্থা হতে পারে; কিন্তু কার্যক্রম বাস্তবায়নে এ ধরনের দ্বৈততা কতটুকু প্রণিধানযোগ্য আ. ন. স. হাবিবুর রহমান হয়ত তার অন্য কোনো লেখায় বিষয়টিকে উপজীব্য করবেন।

ভাবতে অবাক লাগে, সারা পৃথিবীতে যেখানে জনগণের উদ্যোগকে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া হয় সেখানে এদেশে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের নামে জনগণ কর্তৃক গৃহীত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার উদ্যোগকে কেন্দ্রীকরণ করা হলো আর অনেক প্রথিতযশা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা-কুশলীই সানন্দে তা মেনে নিলেন। এ ধরনের উদ্যোগ আমাদের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে কতটুকু পিছিয়ে দিল তা বোঝার জন্য আমাদের হয়ত আরও বিশ বছর অপেক্ষা করতে হবে। সে যাই হোক, অতি দ্রুত সরকারি পর্যায়ে সাক্ষরতা কর্মকাণ্ডের বিস্তৃতি ঘটল এবং সাক্ষরতার হারও বেড়ে গেল অতি দ্রুত। জেলার পর জেলা নিরক্ষরমুক্ত হতে থাকল এবং সংগঠিত হতে থাকল হাজার হাজার সাক্ষরতা কেন্দ্র।

এ অবস্থায় সাক্ষরতা কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত হলো হাজার হাজার সাক্ষরতা কর্মী, যাদের অনেকেই উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রকৃত দর্শনটি উপলব্ধি করতে সক্ষম হলো না। ফাওলো ফ্রেইরির নিপীড়িতের শিখনতত্ত্ব তাদের অনেকের কাছেই কেবলমাত্র বাক্যানুক্রমিক পদ্ধতি বলেই প্রতীয়মান হলো। অধিকন্তু সরকারি সহায়তা প্রাপ্তির আশায় অতি দ্রুত অনেক বেসরকারি সাক্ষরতা সংস্থার জন্ম হলো। যারা প্রকৃত অর্থে গতানুগতিক শিক্ষাপদ্ধতির মতো করেই উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম চালাতে থাকল। ফলে বর্তমানে অনেক সাক্ষরতা কেন্দ্রকেই আর উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাকেন্দ্র বলে মনে হয় না। এসব কেন্দ্রের কঠোরতম নিয়মকানুন, কাঠামোধীন শিক্ষাক্রম, সময়সূচি ইত্যাদি আনুষ্ঠানিক শিক্ষাকেও ছাড়িয়ে গেছে।

তবে আশার কথা এই যে, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা মানুষের সংস্কৃতির সাথে যুক্ত। সংস্কৃতির অপরাপর শাখার মতো উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার চরিত্র হয়ত কলুষিত হবে। আনুষ্ঠানিকতার আড়ালে ঢাকা পড়বে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মুখাবয়ব। প্রাচীনকাল থেকেই বার বার তা হয়েছে; কিন্তু এটি হারিয়ে যায়নি একেবারে। জনগণ তাদের প্রয়োজনে তাদের মতো করেই পুনরায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। আমাদের দেশেও হয়ত আবার নতুন করে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম সাজাতে হবে। এ দায়িত্ব উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা-কুশলীদেরকেই নিতে হবে।

[লেখক ঃ তপন কুমার দাশ, সাক্ষরতাকর্মী, গণসাক্ষরতা অভিযান]